বিবর্তন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারনাগুলো

বন্যা আহমেদ
bonna_ga@yahoo.com

পূর্ববর্তী পর্বের পর :

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তন সম্পর্কে ভ্রান্তির যেন কোন শেষ নেই। একটু খেয়াল করে দেখলে তার কারণটা বুঝে ওঠাও তেমন কঠিন নয়। বিবর্তনবাদ এমন একটি তত্ত্ব যা আমাদের মানব সভ্যতার হাজার বছর ধরে লালন করা ধ্যান ধারণাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তার এবং তার চারদিকের 'সৃষ্টি' নিয়ে ভেবেছে, গান বেঁধেছে, গুহার গায়ে ছবি এঁকেছে, দার্শনিক আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে, কত রং, কত ঢং এর সৃষ্টিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে তৈরি হাজারো রকমের সৃষ্টিতত্ত্বের অস্তিত্ব দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। নিজের উৎপত্তির রহস্যের কোন কূল কিনারা না পেয়ে এবং প্রকৃতির বিশালত্বের মাঝে নিজের অসহায়ত্ব দিশেহারা হয়ে মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন অলৌকিক সত্ত্বার আবির্ভাব ঘটিয়েছে; তেমনি আবার প্রকৃতির অন্যান্য জীবের সাথে তুলনা করে নিজের তথাকথিত 'মহিমায়' মুগ্ধ মানব প্রজাতি নিজেকে সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে বসিয়েছে, নিজেই নিজেকে ভূষিত করেছে শ্রেষ্ঠ 'সৃষ্টি'র সম্মানে। এতো স্বর্গীয় মহিমা, এত আয়োজন তার নিজেকে ঘিরে! সেখান থেকে হঠাৎ করে সাধারণ পৃথিবীর অতি সাধারণ হাজারো জীবের ভিড়ে অন্যতম এক সাধারণ জীবের স্তরে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে আসা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! আসলে বিবর্তনবাদ শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় মানুষের চিন্তা ভাবনা দর্শনের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটিয়েছে, আর তাকে খুব সহজে মেনে নেওয়া তো কঠিণ হওয়ারই কথা। তবে মানুষের এই অসীম কল্পণাশক্তি এবং চিন্তা ক্ষমতার আরেকটি দিক বিবেচনা না করলে হয়তো তার প্রতি চরম অবিচারই করা হয়। জ্ঞান যেখানে আটকে গেছে সেখানে ভিড় করেছে আলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি, কিন্তু সেখানেই তো সে থেমে থাকেনি। আবার যখন নতুন এবং পরিবর্ধিত জ্ঞানের আলোয় আগের অজানা বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে তখনই সে সব বাধা অতিক্রম করে পুরনো ভুলগুলোকে ভেঙ্গে চুড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। তার এই কল্পনাশক্তি, সৃজনীশক্তি এবং তার সাথে যুক্তি দিয়ে বস্তুবাদী চিন্তা দিয়ে তার চারদিকের সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে দেখার অসীম ইচ্ছার কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকে এখানে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আজকে বিজ্ঞান এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Laws) দিয়েই সে তার পারিপার্শ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আজকে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে তা কালের পরপ্রেক্ষিতে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সাক্ষ্য প্রমাণবিহীন কোন অতিপ্রাকৃত স্বত্তার আশ্রয় নেওয়ার কোন দরকার সেখানে নেই।

বিবর্তনবাদকে মেনে নিতে হলে আমাদের সনাতন বহু বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। খুব সহজবোধ্য কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আজকে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আমরা এত ভুল ভ্রান্তি এবং বিরোধিতা দেখতে পাই। আমরা ছোটবেলা থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের সব রকমের ব্যাখ্যা পড়ে বা শুনে বড় হলেও বিবর্তনবাদের মত বিজ্ঞানের মুল একটি তত্ত্বকে আমাদের পাঠ্যসুচী থেকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর তার সাথে যদি যুক্ত হয় সুচিন্তিতভাবে আরোপ করা রাজনৈতিক, সামাজিক বিরোধিতা তাহলে তো আর কথাই নেই। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই যে শুধু বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না তা তো নয়, আমেরিকার মত অগ্রসর দেশেও আজকে বিবর্তনবাদের মত প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। এ দেশের প্রেসিডেন্ট বিনা দ্বিধায় ঘোষণা দেন যে, নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন যেনো বিবর্তনবাদের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানের ক্লাসরুমে পড়ানো হয়। আমেরিকার সংবিধান আনুযায়ী সরকারী স্কুল কলেজে ধর্ম বিষয়ক কোন রকম শিক্ষা নিষিদ্ধ বলে গন্য করা হয়, কিন্তু তারপরও তারা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচীতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পায়তারা করে যাচ্ছেন। এ নিয়ে তারা কোর্ট কাচারিও করে ছাড়ছেন, যদিও এখানকার বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সামাজিক সচেতনতার কারণে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মামলার ফলই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের বিপক্ষে গেছে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদের বিরোধিতাটা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয় এর পিছনে খুব শক্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তি রয়েছে। স্কুলের পাঠ্যসুচীতে বিবর্তনের পাশাপাশি ‘বিজ্ঞান’ হিসেবে বিভিন্ন সাজে সৃষ্টিতত্ত্ব পড়ানোর দাবী তো আছেই, সেই সাথে আছে প্রচলিত পত্র পত্রিকা, ধর্ম প্রতিস্থান, প্রতিপত্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিবর্তন সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচার করার অনবরত প্রচেস্টা। বিজ্ঞানীরাও এখন অনেক স্বীকার করেন যে, তারা শুধু এতদিন গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, সাধারণ মানুষকে বিবর্তন সম্বন্ধে অবগত করানোর বা বোঝানোর গুরু দায়িত্ব তারা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এখন রিচার্ড ডকিন্স থেকে শুরু করে কেনেথ মিলার, টিম বেড়া, ডগলাস ফুটুইমা, আর্নেস্ট মায়ার (প্রয়াত) মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা কার্ল স্যাগানের পথ ধরে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

বিবর্তনবাদেও এখনও অনেক বিতর্কিত বিষয় রয়েছে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই এখানেও বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখনও একমত হতে পারেননি। কিন্তু গত একশো বছর ধরে বিবর্তনবাদের মুল বিষয়বস্তু অর্থাৎ সব জীবই যে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে (descent, with modificatiom, of all organism from common ancestors) তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আজকে পদার্থের আনবিক গঠণ, পৃথিবীর গোলত্ব বা সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে - এগুলো যেমন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবর্তনবাদও ঠিক তেমনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ডঃ ডগলাস ফুটুইমা তার ‘Evolution' বইতে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, আজকে ৪০% এর বেশি আমেরিকান বিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাস করে না, তারা মনে করে সৃষ্টিকর্তা সরাসরিভাবে মানুষ তৈরি করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপের বেশীরভাগ মানুষই বিবর্তনবাদকে মেনে নিয়ছেন, তারা নাকি অবাক হয়ে যায় শুনে যে, আমেরিকার মত এত বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর একটা দেশে কি করে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এতো অবৈজ্ঞানিক ধারণা এখনও টিকে থাকতে পারে (১)! ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক (National Geographic) সাময়িকীর ২০০১ সালে সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৪৫% আমেরিকান যে শুধু বিবর্তনের অবিশ্বাস করে তাই নয়, তারা এখনও মনে করে যে মানুষ এই অপরিবর্তিত রূপেই ৬ হাজার বছর আগে ঈশ্বর কতৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিল। তবে প্রায় ৩৭% মনে করেন যে, ঈশ্বর প্রাথমিকভাবে জীবন তেরি করলেও তারপর বিবর্তনের মাধ্যমেই সকল জীবের উদ্ভব ঘটেছে।

আসলে বিবর্তনবাদের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন রকমের ভাগ এবং স্তর রয়েছে। এক্কেবারে গোঁড়ারা বিবর্তনবাদ তো দুরের কথা, এখনও বাইবেলের সেই সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাস করেন। অনেকে এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ছয় হাজার বছর আগেই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো এবং সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের ডায়নোসরের অস্তিত্ব আজগুবি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এরকম হাজার হাজার সাইট খুঁজে পাবেন। এই খ্রিষ্টান এবং ইহুদি মৌলবাদীরা পুরোপুরিভাবেই বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করেন। হারুন ইয়াহিয়া বলে তুর্কি এক স্বঘোষিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তার

‘The Evolution Deceit’ বইতে কোরানে বর্ণিত ছয় দিনের পৃথিবী সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে বিবর্তনবাদ আজকের পৃথিবীর আধিপত্যকারী শক্তির দ্বারা তৈরি একধরণের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে অনেকেই আছেন যারা বিজ্ঞানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, কিন্তু এখান থেকে সেখান থেকে শুনে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষন করেন। আমাদেরকে যেহেতু বিজ্ঞানের পাঠ্যসুচীতে পরিস্কারভাবে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না তাই অনেকেই আবার ইন্টারনেটের সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বিবর্তনবিরোধী সাইটগুলো থেকে তথ্য জোগার করে বেশ জোরেসোরে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে দেন। আসলে বিবর্তনতত্ত্ব হচ্ছে আজকে জীববিদ্যার সকল শাখার অন্যতম ভিত্তিমুল, একে ছাড়া জীববিদ্যাই অচল হয়ে পড়বে, তাই এর উপর পৃথিবীর নাম করা সব বিজ্ঞানীদের লেখা হাজারো বই রয়েছে, তাদের কোন একটি বই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই কিন্তু বেশিরভাগ ভুল ধারণাগুলো কেটে যায়, কিন্তু এতটুকু কষ্টই বোধ হয় অনেকের আর করে ওঠা হয় না। মজার জিনিস হচ্ছে, ডারউইন এবং ওয়ালেস বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি দেওয়ার পর বেশীরভাগ মানুষই এর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু গত দেড়শো বছরে বিজ্ঞানের অভুতপূর্ব উন্নতির ফলে এখন তারা আর পুরোপুরিভাবে একে অস্বীকার করতে পারেন না, যারা এ সম্পর্কে একটু খবর রাখেন তারা অনেকেই বলেন যে মাইক্রো বিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে তবে ম্যাক্রো বিবর্তন নাকি অসম্ভব একটি ব্যাপার। নীচে আমি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাময়িকী থেকে শুরু করে বিবর্তনবাদের উপর লেখা বেশীরভাগ পাঠ্য বই এবং পপুলার সাইন্সের বইতে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে, এখানে আমি তার সারমর্ম দেওয়ার চেষ্টা করবো।

১) বিবর্তনবাদ শুধুই একটি তত্ত্ব (Theory) এর মধ্যে কোন বাস্তবতা বা সত্যতা (Fact) নেই

এই ধরণের কথা যারা বলেন তাদের কাছে বোধ হয় তত্ত্ব এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক পরিষ্কার নয়। চলুন প্রথমে না হয় সেটাই একটু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা যাক। কোন পর্যবেক্ষণ যখন বারংবার প্রমাণিত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তবতা বা সত্য বলে ধরে নেই। আর এদিকে তত্ত্ব হচ্ছে এই বাস্তবতা, প্রাকৃতিক নিয়ম, বা পরীক্ষিত কোন প্রকল্প কিভাবে ঘটছে, অর্থাৎ সেই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা। যেমন ধরুন, আপেল কেন মাটিতে পড়ে- এটি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে তা খুব ভালভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে আপেল পড়ার ব্যাপারটা হচ্ছে বাস্তবতা। আর নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র যা দিয়ে এই আপেল পড়ার প্রক্রিয়াটাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তা হল তত্ত্ব। দেখা গেল এই মহাকর্ষ তত্ত্ব খুব ভালভাবেই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু আইনস্টাইন এসে দেখালেন নিউটনের মহাকর্ষ নিয়ম কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ে, মানে তার তত্ত্ব সঠিক ফল দেয় না। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কখন? যখন বস্তু কণা ছুটতে থাকে আলোর বেগের কাছাকাছি কিংবা যে সমস্ত জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব খুব বেশী (যেমন ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি)। এ সমস্ত পরিস্থিতিতে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের চেয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব (General theory of relativity) আরও নিঁখুত ফলাফল দেয়। শুধু তো তাই নয়, এইতো সেই দিন বহুলভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানের সাময়িকী Disccover এর অগাষ্ট ২০০৬ সংখ্যায় দেখলাম মোর্ডেহাই মিলগ্রম (Mordehai Milgrom) নামের এক বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের তত্ত্বকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন, কারণ মোর্ডেহাইয়ের তত্ত্বে সেই রহস্যময় ‘ডার্ক ম্যাটার’ এর ধারণা গ্রহণ করার দরকার নেই। তাহলে কি আমরা বলবো যে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউটনের (বা আইনস্টাইনও যদি কখনও ভুল প্রমাণিত হয়) মহাকর্ষের সুত্রকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বিধায় গাছ থেকে আপেল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি আপেলগুলো গাছের ডাল এবং মাটির মাঝামাঝি শুন্যে ঝুলে রয়েছে? বিজ্ঞান তো স্থবির নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া সাক্ষ্যগুলোর

চুলচেরা ক্রস-বিশ্লেষণের পরেই এরকম তত্ত্বগুলো হাজির করা হয়। যে তত্ত্বটি সবচেয়ে ভালভাবে বাস্তবতাকে (Reality) এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছে সেই তত্ত্বটিকেই গ্রহণ করা হয়। তার পরও সন্দেহমুক্তি ঘটে না; এর চেয়ে আরও ভালো বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেই পারে, তখন বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ীই যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নতুন ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান এভাবেই এগোায়, নতুন নতুন এবং উন্নততর তত্ত্বের মাধ্যমে বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। এদিকে আবার কিছু বাস্তবতা বা সত্য আছে যা চোখের সামনে সারসারি দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিবারই তাকে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা সম্ভব, যেমন ধরুন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বা অনু পরমাণুর গঠণ ইত্যাদি, কিন্তু এরা যে বাস্তব তা নিয়ে সন্দেহর কোন অবকাশ নেই।

বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য। এটি একটি বাস্তবতা যে, জীব স্থির নয় বরং বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তন ঘটে আসছে, তাদের কাউকেই পৃথক পৃথকভাবে তৈরি করা হয়নি, তারা সাধারণ পূর্বপুররুষ থেকে বিবর্তন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে। এই বাস্তবতাটি গত দেরশো বছর ধরে বারবার বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আগের অধ্যায়গুলোতে এই প্রমাণগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিবর্তন ঘটছে, এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কোন তত্ত্বের মাধ্যমে সবচেয়ে পূর্ণাংগভাবে প্রমাণ করা যাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও বিতর্ক চলছে। ডারউইন নিজেও এই দু’টো বিষয়কে আলাদা করে উপস্থাপণ করেছিলেন। ‘The Descent Of Man’ বইতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, এখানে দু’টো পৃথক বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন। প্রথমটি হচ্ছে যে কোন প্রজাতিকেই পৃথকভাবে তৈরি করা হয়নি, আর দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমের প্রধানতঃ এই পরিবর্তন ঘটে থাকে। তিনি এই বলেও সাবধান করে দেন যে, যদি তিনি ভুলবশত প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর অত্যাধিক জোর দিয়েও থাকেন তার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে এটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে, প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টির মতবাদটি অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়(২)।

অনেকে সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরাই দাবী করেন যে, যেহেতু বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এখনও বিবর্তন নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে যাচ্ছেন তা থেকে নাকি প্রমাণিত হয় বিবর্তনবাদের কোন ভিত্তি নেই। আবারও, একই কথা বলতে হয় এর উত্তরে। বিজ্ঞানীরা বিবর্তন কিভাবে ঘটছে অর্থাৎ বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিবর্তনবাদের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ বিবর্তন আদৌ ঘটছে কিনা তা নিয়ে একবারও সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কারণ বিবর্তনের এই বাস্তবতটুকু আনেক আগেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিতর্ক চলেছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়েঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনই কি একমাত্র বা প্রধানতম কারণ নাকি এমন অনেক জেনেটিক বা বংশতীয় পরিবর্তন থাকতে পারে যারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতাভুক্ত না হয়েই বিবর্তন ঘটাতে পারে; আসলেই কি বিবর্তন শুধুমাত্র ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে নাকি কোন কোন সময় তার এই গতিতে উল্লম্ফনও ঘটতে পারে। বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে বিচার করলে এই বিতর্কগুলোকে অত্যন্ত সুস্থ এবং বৈজ্ঞানিক বলেই ধরে নিতে হবে। এর মাধ্যমেই হয়তো একদিন আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারবো ঠিক কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা যখন একে পুঁজি করে বিবর্তনবাদের দূর্বলতা খুঁজতে থাকেন তখন তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না।

২) প্রকৃতিতে মাইক্রো বিবর্তন ঘটতে দেখা গেলেও ম্যাক্রো বিবর্তন ঘটার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাঃ

এই (কু)যুক্তিটি বিবর্তনবাদের বিরোধীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তারা সুযোগ পেলেই এই ব্যাপারটাকে সামনে নিয়ে আসেন। শুধুমাত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এটা বলেন বললে বোধ হয় পুরোটা বলা

হয় না। ম্যাক্রো বিবর্তনের ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে ওঠার জন্য বিবর্তনবাদের গভীরে যতটুকু ঢোকা দরকার সেটা তারা করেন না, কিন্তু তারা জানেন যে, ম্যাক্রো বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বসুরী প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতি সৃর্ষ্টি হতে হাজার, লক্ষ, কোটি বছর লেগে যেতে পারে, এ তো আর চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায় না, তাই এ বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব সহজেই সংশয় সৃষ্টি করা সম্ভব - আর সেটারই সুযোগ নেন তারা। প্রজাতির সংগা কি? বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত সংগাটি অনুযায়ী, প্রজাতি হচ্ছে এমন এক জনসমষ্টি যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, তারা অন্য প্রজাতির সাথে প্রজননগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা 'চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন' অধ্যায়ে উদ্ভিদের মধ্যে বেশ অল্প সময়েই এ ধরণের নতুন প্রজাতি উৎপন্ন হতে দেখেছি, রিং বা চক্রাকার প্রজাতির মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে নতুন ধরণের প্রজাতি তৈরি থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রজাতি তৈরির উদাহরণ হতে দেখেছি। এখন বিবর্তনবাদের বিরোধীরা বলতে শুরু করবেন, এই সব ক্ষেত্রেই তো এক ধরণের উদ্ভিদ থেকে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ বা টিকটিকি থেকে আরেক ধরণের টিকটিকিই তৈরি হচ্ছে, এমন তো না যে বানর থেকে মানুষ বা ডায়নোসর থেকে পাখি বা জলহস্তির মত স্থলচর জীব থেকে সমুদ্রের দৈত্যাকার মাছ তিমি উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে - যে ধরণের ব্যাপার স্যাপার বিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে বলে বিজ্ঞানীরা দাবী করেন। হুমমম, অবশ্যই একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। বিবর্তনবাদের পিছনে যে বিজ্ঞান কাজ করছে তা বুঝলে প্রশ্নটার উত্তর একটু কঠিণ হলেও অবোধ্য হওয়ার কথা নয়। বিভিন্ন সময় আগের অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার আলাপ করা হলেও তাদেরকে একসাথে করে বিস্তারিতভাবে না হয় আরেকবার প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যাক। আগের লেখায় বিবর্তনের তত্ত্ব নিয়ে অনেকই আলোচনা করেছি, এখন আর বেশী তত্ত্ব কথায় না গিয়ে কিছু উদাহরণ, গবেষনা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে রাতারাতি ঘটে যাওয়া নাটকীয় কোন চটকদার পরিবর্তনের ধারণা বিবর্তনের তত্ত্বে জায়গা পায়নি। আগেই দেখেছি আমরা যে, বিবর্তন ঘটে অত্যন্ত মন্থর গতিতে, প্রাকৃতিক নির্বাচন, মিউটেশন, জেনেটিক ড্রিফট, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, বংশগতীয় বা জেনেটিক রিকম্বিনেশন সহ বিভিন্ন কারণে প্রজাতির মধ্যে ছোট ছোট পরিবর্তন বা মাইক্রো বিবর্তন ঘটতে থাকে। আর বহু মাইক্রোবিবর্তনের মাধ্যমে ঘটা সম্মিলিত পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে একসময় প্রজাতি বা প্রজাতিটির একটি অংশ অন্য আরেকটি প্রজাতিতে পরিণত হয়। অনেক বিজ্ঞানী বিবর্তনে উল্লম্ফন এবং মেগাবিবর্তনের কথা বলেন, এই উল্লম্ফনগুলোও এক প্রজন্মে ঘটে না, বিশেষ কোন সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে (যেমন, আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা পরিবেশগত পরিবর্তন) কোটি কোটি বছরের জায়গায় হয়তো হাজার হাজার বছর লাগে এই 'তড়িৎ' বিবর্তনগুলো ঘটতে। ব্যাপারটা এমন নয় যে একদিন সকালে উঠে দেখা গেলো যে, আমাদের পূর্বপুরুষ এক বনমানুষ থেকে এক মানব শিশু জন্ম নিয়ে ফেলেছে এবং সবাই অবাক হয়ে দাড়িয়ে তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছে। যেমন ধরুন একধরণের বন মানুষ থেকে প্রায় ৮০-৪০ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষের পুর্বপুরুষদের বিবর্তন ঘটতে শুরু করে তখন খুব ধীরে হাজার হাজার বছরের বহু ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শুরু করে এবং সেই সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে তাদের মস্তিষ্কের আকারও বড় হতে শুরু করে। প্রায় ৫৫-৩০ লক্ষ বছর আগের মানুষের পুর্বপুরুষদের যে অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, কিভাবে সময়ের সাথে সাথে ক্রমশঃ বনমানুষের চারপায়ী বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে যাচ্ছে এবং ফসিলগুলো যত আধুনিক সময়ের দিকে এগিয়ে আসছে ততই আরও বেশী করে আমাদের মানুষের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে উঠছে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো এতই ধীরে ধীরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঘটেছে যে কোন এক প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে তা বোঝার কোন উপায় থাকে না। সেই সময়ে আরেক গ্রহ থেকে কোন এক বুদ্ধিমান প্রাণী এসে এই পূর্বপুরুষদের দেখলে অবাক হয়ে বলতো না, 'ও

আচ্ছা ওরা তো দেখছি অর্ধেক মানুষে পরিণত হয়ে বসে আছে, এখনও গাছেও ঝুলছে, দু'পায়ের উপর ভর করে মাটিতেও হাটতে শিখেছে, মস্তিষ্কের আকারও আগের চেয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু পূর্ণাংগ মানুষ হতে তো ওদের আরও কয়েক লক্ষ বছর লেগে যাবে!' যখন যে প্রজাতি যে অবস্থায় থাকে সেটাই তার পুর্নাংগ রূপ, সেই সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওই বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। অতীতের দিকে তাকিয়ে, আমরা কয়েক লক্ষ বা কোটি বছরের ব্যবধানে পাওয়া বিবর্তিত হতে থাকা প্রাণীদের ফসিল রেকর্ড দেখে যেভাবে মধ্যবর্তী প্রজাতি বলে সনাক্ত করতে পারি, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে তা বোঝার কোন উপায় থাকে না। এভাবে চিন্তা করলে একদিকে যেমন বলা যায় মধ্যবর্তী ফসিল বলে কিছু নেই আবার উলটোভাবে সেই আদি জীবের উদ্ভবের পর সবাই আসলে কারও না কারও মধ্যবর্তী জীব। সব উভচর প্রাণী মাছ এবং সরীসৃপের মধ্যবর্তী অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, আবার ওদিকে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা উভচর এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাঝখানের অবস্থা ধারণ করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছেন যে গত কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের মস্তিষ্ক ক্রমাগতভাবে আরও বড় হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা এখনও বিবর্তিত হচ্ছি, তার মানে তো এই নয় যে আমরা কোন মধ্যবর্তী অবস্থায় আটকে আছি। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স তার 'The Ancestor's Tale' বইতে বেশ মজা করেই বলেছেন, এই যে আমরা প্রায়ই প্রশ্ন করি 'মানুষের প্রথম পুর্বপুরুষ কে ছিলো' - এটা আসলে বোকার মত একটা প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, অত্যন্ত ধীরগতিতে ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকা বিবর্তনের প্রক্রিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে এই ধরণের প্রশ্নগুলোর আসলে কোন অর্থই হয় না। বিবর্তনের দৃষ্টিতে অর্থপূর্ণভাবে প্রশ্ন করতে হলে এভাবে হয়তো জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, 'মানুষের সবচেয়ে আগের কোন পুর্বপুরুষ বা পুর্বপুরুষরা স্বাভাবিকভাবে দুই পায়ের উপর হাটতে শিখেছিলো?' বা ' আমাদের কোন পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কের আকার ৬০০ সিসির চেয়ে বড় ছিলো?' (৩)।

কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে এই পরিবর্তন তো চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে বিজ্ঞানীরা কি করে বলছেন যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি আসলেই ঘটেছিলো? বিজ্ঞানের সব তত্ত্বই তো শুধু চোখের সামনে দেখে প্রমাণ করা হয় না। তাহলে তো ভূতত্ত্ববিদ্যার প্লেট টেকটনিক্স, মহাদেশীয় সঞ্চরণ থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যার পরমাণুর গঠণ বা বিগ ব্যাং এর মত সব তত্ত্বকেই আজকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, প্রজাতির উদ্ভব বা জীবের ম্যাক্রো পরিবর্তনের তত্ত্বটি আজকে ফসিল রেকর্ড ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের এতগুলো আধুনিক শাখার সাহায্যে এত উপায়ে পরীক্ষিত যে, যারা এ নিয়ে এখনও সন্দেহ করেন তাদের পায়ের নীচে মাটি নেই বললেই চলে। পানির মাছ থেকে স্থলচর চারপায়ী প্রাণীর বিবর্তন কিংবা সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধারাবাহিক ধাপের একটি দুটি নয় বরং অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে (৪), আজকে আনবিক জীববিদ্যা এবং জেনেটিক্স বা জিনোমিক্স থেকেও যে সব অভুতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে তা এই ফসিল রেকর্ডগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়। যেমন ধরুন, স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্তরসূরী সরীসৃপের নীচের চোয়ালে পাঁচটি পৃথক পৃথক হাড় রয়েছে, কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোয়ালে রয়েছে মাত্র একটি হাড়। সরীসৃপের চোয়ালের হাড়গুলো ধাপে ধাপে কমতে শুরু করে এবং ফসিল রেকর্ড থেকে আজকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে পাই কিভাবে তা স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের হাড়ে রূপান্তরিত হয়েছিলো। এই ধাপে ধাপে পরিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে ফসিলবিদেরা একাধিক 'মাঝামাঝি' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ট্রায়াসিক যুগের তথাকথিত 'স্তন্যপায়ী জাতীয় সরীসৃপ' প্রাণীর ফসিল খুঁজে পেয়েছেন। এদের মধ্যে এই বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপের দুটি স্তরই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যায় (২), এদের রয়েছে দু'টো চোয়ালের জয়েন্টঃ একটি হচ্ছে ক্রমশঃ ছোট হতে থাকা সরীসৃপের চোয়াল আরেকটি হচ্ছে নতুন ধরণের চোয়াল। পরবর্তীতে ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে দেখা যায় যে, সরীসৃপের চোয়ালটির কাজ ধীরে ধীরে বদলে কানের হাড়ে পরিণত হচ্ছে । আজ পর্যন্ত আমরা এই বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছি, একারণেই কিছু চিবানোর সময় আমরা

কানের ভিতরে চোয়ালের হাড়ের নাড়াচাড়া আনুভব করতে পারি। এই প্রতেকটি টপিক নিয়ে আলাদা আলাদা করে হাজারো বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে শ'য়ে শ'য়ে বই লেখা হয়েছে। এ 'Vertebrate Evolution' বা 'Evolution of Mammals' লিখে www.amazon.com নামের অনলাইন বইয়ের সাইটে সার্চ দিলে এই সব বিষয়ের উপর গবেষণারত বিজ্ঞানীদের লেখা গাদি গাদি বইয়ের নাম বেড়িয়ে পড়বে।

এটা কি একটা শুধুই কাকতলীয় ব্যাপার যে, উভচর প্রাণীর উৎপত্তির আগে সরীসৃপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, বা সরীসৃপের আগে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল খুঁজে পাওয়া যায় না? এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে যে, এখন পর্যন্ত এমন কোন স্তরে এমন একটি অদ্ভুত ফসিল পাওয়া যায়নি যা দিয়ে বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করা যায়। আজকে বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষ এক ধরণের বনমানুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে, এখন যদি দেখা যায় বন মানুষ জাতীয় প্রাইমেট তো দুরের কথা স্তন্যপায়ী প্রাণী উৎপন্ন হওয়ার অনেক আগে সেই ক্যাম্বরিয়ান যুগেই মানুষের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে, তাহলেই তো বিবর্তনের তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়ার কথা। যারা বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করেন তাদের একবার ভেবে দেখা দরকার কেনো আজ পর্যন্ত যে হাজার হাজার ফসিল পাওয়া গেছে তার একটিও ভুল স্তরে পাওয়া যায়নি! এক কোষী প্রাণী, বহু কোষী প্রাণী, মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণিদের ফসিলগুলো তাদের বিবর্তনের ধারাবাহিক স্তর ছাড়া অন্য পূর্ববর্তী কোন স্তরে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে না কেনো। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী হ্যালডেন একবার বলেছিলেন কেউ যদি প্রিক্যাম্বরিয়ান স্তরে একটি খরগোশের ফসিল খুঁজে পায় তাহলে তিনি বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিবেন। আমি 'মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই' অধ্যায়ে পাখি, তিমি মাছ, মানুষ এবং চারপায়ী স্থলচর প্রাণীদের মধ্যেবর্তী ফসিলগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। স্থলচর প্রাণী থেকে পানিতে অভিযোজিত হয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের প্রজাতি তিমি মাছে পরিণত হওয়ার বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছি সেখানে। এই তিমির বিবর্তনটা বেশ গোলমেলে, বিজ্ঞানীরা প্রায় কয়েকশো বছর ধরে ব্যাপারটা নিয়ে হিমশিম খেয়ে শেষ পর্যন্ত খুব সাম্প্রতিককালে রহস্যটার কুলকিনারা করতে পেরেছেন। ব্যাপারটা যেহেতু বেশ একটু অন্যরকম তাই ম্যক্রো বিবর্তনের উদাহরণ হিসেবে এখানে এটাকেই বেছে নিচ্ছি বিস্তারিত আলোচনার জন্য। দেখা যাক তাহলে এই বৈজ্ঞানিক আবিস্কারটির পিছনে কতগুলো ছিলো বিজ্ঞানীদের কল্পনার তুলিতে আঁকা ছবি এবং মনগড়া ব্যাখ্যা আর কতগুলো এসেছিলো এক্কেবারে হাতেনাতে পাওয়া সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ ফসিল রেকর্ড, জেনেটিক্স বা আনবিক জীববিজ্ঞানের মত বিজ্ঞানের আধুনিক শাখাগুলো থেকে পাওয়া প্রমাণগুলোর অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে।

এই বিশাল বপুর তিমি 'মাছ'গুলো বেশ অদ্ভুত। আমরা আর সব মাছের মতই এই গভীর সমুদ্রে বাস করা প্রাণীটাকে 'মাছ'ই বলি কিন্তু এদের সাথে মাছের বৈশিস্ট্যের মিল খুব কমই বললে চলে। সেই ১৬৯৩ সালে ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ জন রে তিমিকে ডাঙ্গার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাথে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ডারউইনের আগের বিজ্ঞানীরা ভেবে কুল কিনারা পাননি এই তিমিগুলো কি স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুর্বপুরুষ নাকি তারা তাদের উত্তরসুরী! ডারউইন যখন বললেন যে তিমিগুলো ভালুকের মত কোন প্রাণী থেকে বিবর্তিত হলেও তিনি অবাক হবেন না তখন তাকে নিয়ে এমনই হাসাহাসি করা হয়েছিল যে, তিনি তার Origin of species বই এর পরের সংস্করণ থেকে তা বাদই দিয়ে দিয়েছিলেন(৫)। এর পরেও বিভিন্ন বিজ্ঞানী তিমি মাছের বিবর্তন নিয়ে হিমসিম খেয়েছেন, তাদের শরীরের বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলো যে তাদের মাটি থেকে পানিতে বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে তা তো বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তিমির দেহে এখনও রয়ে গেছে পাঁজরের এবং পায়ের হাড়ের অংশবিশেষ, তাদের কানের পাশে এখনও বেশ কয়েকটি মাংশপেশী রয়ে গেছে যেগুলো শুধুমাত্র কান নাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হতে পারে (কিছু কিছু

স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী তা করে থাকে) , বেলুগা জাতের তিমিতে এখনও লুপ্তপ্রায় বহির্কর্ণের অংশ রয়ে গেছে যেগুলো গভীর সমুদ্রে বাস করা জীবের কোন কাজেই আসতে পারে না (১১)। ১৯৪৫ সালে জর্জ গেলর্ড সিম্পসন লিখেছিলেন যে, এই তিমিরা হচ্ছে স্তনয়পায়ী প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত এবং তার জানা ফসিল রেকর্ড থেকে তিমির উৎপত্তি এবং শ্রেনীবিভাগ করা একধরণের অসম্ভবই বলতে হবে(৬)। কিন্তু এর পরপরই ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষা করে জানালেন যে, তারা সেরাম প্রোটিনের তুলনামুলক পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে Cetacea অন্তর্ভুক্ত তিমি মাছের সাথে Artiodactyla (এই অর্ডার বা বর্গের মধ্যে জোড়া সংখ্যক আঙ্গুল বিশিষ্ট গরু, হরিণ, জলহস্তী ইত্যাদি রয়েছে) জাতের প্রাণীদের সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য রয়েছে(৬)। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ভ্যন ভ্যালেন আবার তিমিকে mesonychid condylarths নামক বিলুপ্ত এক মাংশাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্তরসুরী বলে সনাক্ত করেন। ৭০ এর দশকে আমেরিকান ফসিলবিদ ডঃ ফিলিপ গিঙ্গরিচ (Philip D. Gingerich) এবং তার দল তিমির পুর্বপুরুষের বেশ কয়েকটি প্রাচীন ফসিল খুঁজে পান মিশর এবং পাকিস্তানে(৯)। প্রায় ৫ কোটি বছরের পুরনো *Pakicetus* নামক (বিভিন্ন স্তরের ছবিগুলোর জন্য 'মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই' অধ্যায়টি দেখুন) এক ধরণের স্থলচরী স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় যার কানের হাড় গুলো তিমির মত হলেও করোটিটি দেখতে কুকুর জাতীয় প্রাণীর মত। তারপর তারা আরেকটু পরের সময়েয় ফসিল খুঁজে পেলেন যার পায়ের পাতা হাসের পায়ের পাতার মত ছড়ানো, কিন্তু পাগুলো তখনও হাটা বা সাতারের জন্য যথেষ্ট শক্ত রয়ে গেছে। তারা মজা করে এর নাম দিয়েছিলেন 'Walking and swimming whale' । তারা আরও পেলেন *Rodhocetus* এর ফসিল, এরা ইতোমধ্যেই পানিতে সম্পুর্ণভাবে অভিযোজিত হয়ে গেছে, তাদের নাকের ছিদ্র সরে গেছে অনেক পিছনে (আধুনিক তিমির মত তার পিঠের যে ছিদ্র থেকে পানি উৎক্ষেপন করে তার প্রায় অর্ধেক পথ দুরে), পাগুলো হয়ে গেছে আনেকটা ফ্লিপারের মত। তিমির বিবর্তনের ধারাবাহিকতার চিত্রটি যেনো ফুটে উঠতে শুরু করেছে চোখের সামনে। ফিলিপ গিঙ্গরিচ এর দল তখন ভাবছেন আর কয়েকটি ফসিল পেলেই তারা প্রমাণ করে ফেলতে পারবেন যে তিমি আসলেই mesonychid থেকেই বিবর্তিত হয়েছে(৭, ৯)।

কিন্তু এর মধ্যে আনবিক জীববিদেরা ডি এন এ হাইব্রিডাইজেশন এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকে জেনেছেন যে মাংশাসী mesonychid নয় বরং খুরবিশিষ্ট তৃনভোজী Artiodactyla দের সাথেই তিমির সবচেয়ে বেশী জেনেটিক সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। গিঙ্গরিচ এর দল তখন আবার ফিরে গেলেন পাকিস্তানের নতুন এক জায়গায় আরও নতুন ফসিল আবিষ্কারের আশায়। শেষ পর্যন্ত বহুদিনের আপেক্ষার পর তারা *Artiocetus clavis* এবং *Rodhocetus balochistanensis* এর বিভিন্ন ফসিল খুঁজে পান যাদের কঙ্কাল, গোড়ালীর হাড় এবং জয়েন্ট এবং করোটি থেকে বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখা যায় যে তিমির পুর্বপুরুষেরা তৃনভোজী খুরবিশিষ্ট জলহস্তী পুর্বপুরুষ থেকেই বিবর্তিত হয়েছিলো। বিজ্ঞানীরা আধুনিক তিমির যে পাঁচটি মধ্যবর্তী স্তর পেয়েছেন তাদের মধ্যে *Rodhocetus (*এবং *Artiocetus)* এর একাধিক প্রায়-সম্পুর্ন ফসিল পাওয়া গেছে, *Basilosaurus* এবং *Doruden* এর পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি করে আশ্চর্যজনকভাবে সম্পূর্ণ ফসিল (৭)। বিজ্ঞানীরা কয়েক দশকের গবেষণার পর তিমির ম্যাক্রোবিবর্তন নিয়ে যে সিধান্তে পৌছেছেন তার পিছনে যে অক্লান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য এবং সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে তা জানলে আমাদের মত সাধারণ মানুষের অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। Paleobiology, জার্ণালের ২০০৩ সালের ২৯।৩ সংস্করণে প্রকাশিত রিসার্চ পেপারে তার আবিষ্কার এবং সেই সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের বিস্তারিত বর্ণনা করে উপসংহার টানেন, "The fossils we know well support the idea of a unidirectional trend of increasing aquatic adaptation through *Rodhocetus* and *Dorudon* stages of whale evolution. However, superimposed on this is simultaneous change in locomotor adaptation involving a distinct reversal of

specialization, from hindlimb-dominated swimming in *Rodhocetus*, to lumbusand tail-dominated swimming in *Dorudon* Thus the overall pattern is neither simple nor direct. It is common to see microevolutionary histories zig-zag back and forth through time as they reverse themselves to track changing opportunities, and the land-tosea transition of early whales provides a macroevolutionary example.(৮)"

এবার চোখ ফেরানো যাক জীববিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো যেমন, আনবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স জিনোমিক্স থেকে ম্যাক্রো বিবর্তনের পক্ষে পাওয়া প্রমাণগুলোর দিকে। আজকে মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণীর সম্পুর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। 'The great tree of life' এর ধারণা কোন মনগড়া ক্ষ্যাপা বিজ্ঞানীর উর্বর মস্তিষ্ক প্রসুত গল্প নয়। ডারউইন তার সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থেকে সমস্ত জীবকুল যে একই আদি পুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলে প্রকল্প দিয়েছিলেন তা আজকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের কল্যাণে সুপ্রিতিস্ঠিত একটি তত্ত্ব। আগে বিজ্ঞানীদের ফসিল রেকর্ড এবং জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে প্রাণের শ্রেনীবিভাগ করতে হত, এখন তা ক্রস পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে। এটা এখন প্রমাণিত যে, বিবর্তনের সম্পর্কে যে জীব যত অন্য জীবের কাছের সময়ের ততই তাদের মধ্যে ডিএনএ, আরএনএ বা প্রোটিনের সাদৃশ্য বেশী, কয়েক শো বছর ধরে পাওয়া ফসিল রেকর্ডের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রায় হুবুহু মিলে যাচ্ছে! আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাইরাস, ব্যকটেরিয়া, ঘাস, উদ্ভিদ, থেকে শুরু করে কৃমি, পাখী, মাছ, মানুষ পর্যন্ত সবাই একই জটিল আনবিক মেশিন বা গঠণ বহণ করে চলেছে, জীবনের ডি এন এ , আর এন এ কোড, প্রোটিন সিন্থেসিস এর প্রক্রিয়া এবং এনার্জি সঞ্চলনের এ টি পি (ATP) সিস্টেমও তাদের এক। মানুষ, শিম্পাঞ্জী, ইদুর, সহ বিভিন্ন প্রাণীর জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে, আরও অনেক প্রাণীর জিন পড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে। খুব সাম্প্রতিককালের আধুনিক জেনেটিক গবেষণা (১০) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জীর জিনের সাথে আমাদের জিন ৯৯% মিলে যাচ্ছে আর ডি এন এর সন্নিবেশ এবং বা মুছে যাওয়া (DNA insertion and deletion) ধরলে এই মিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬%। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের ডি এন এর গড়পরতা যে মিল তার চেয়ে একটা শিম্পাঞ্জীর সাথে একটা মানুষের মিলের পরিমাণ মাত্র ১০% কম। মানুষের সাথে ইদুরের যে পার্থক্য তার চেয়ে মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জীর পার্থক্য ৬০% বেশী। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জী যে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো তা নিয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই(১১)।

এখানেই গল্পের কিন্তু শেষ নয়, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া বিবর্নবাদের পক্ষের সাক্ষীগুলো লিপিবদ্ধ করতে গেলে মহাভারত লিখতে হবে। যেমন ধরুন UBX জিনের আবিষ্কারের পর (এডয়ার্ড লুইস এই জিনটি আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন)আমরা জানতে পারছি যে, এই জিনগুলো দিয়ে জীবের শরীরের গঠনের প্ল্যান, এবং বিভিন্ন জীবের গঠনের মধ্যে পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই UBX জিনগুলো HOX জিনের অংশ এবং তাদেরকে স্পঞ্জ থেকে শুরু করে ফ্রুট ফ্লাই বা স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর দেহে পাওয়া যায়। তারা 'অন' না 'অফ' হয়ে আছে তার উপর নির্ভর করছে প্রাণীর শরীরের বিভক্তিকরণ থেকে শুর করে পা, এ্যন্টেনা বা পাখার গঠণ। এই জিনগুলোর উপর ঘটা মিউটেশন থেকেই সাপ তার পা হারিয়েছে, মাছের লোব ফিন থেকে হাতের উৎপত্তি ঘটেছে বা মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে চোয়ালের বিবর্তন ঘটেছে। এখান থেকে এখন বিবর্তনের বিভিন্ন বড় বড় ধাপের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, বিজ্ঞানীরা ল্যবরেটরিতে ইতমধ্যেই এমন অনেক পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং আরও চালিয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে এখন নামে জীববিজ্ঞানে এক নতুন শাখারই জন্ম হতে চলেছে।। আগামীতে এই

আনবিক জীববিদ্যা ও জেনেটিক্সের আলোয় বিবর্নতবাদের উপর বিস্তারিত একটি অধ্যায় লেখার ইচ্ছে রইলো।

৩) দু'চারটি আংশিক ফসিল বা হাড়গোড় পেয়েই বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের সপক্ষে বড় বড় সিদ্ধান্ত টানেনঃ

এই ধরণের দাবী মনে হয় শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক নেই এমন মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। বিজ্ঞান যদি বারবার প্রত্যক্ষ্য কিংবা পরোক্ষভাবে পরীক্ষা না করে, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির না করেই দু একটি হাড়গোড় দেখেই বিবর্তনবাদের মত একটি যুগান্তকারী তত্ত্বে পৌঁছে যেতে পারে তাকে কিভাবে বিজ্ঞান বলা যায় তা আমার জানা নেই। বড়ই জানতে ইচ্ছে করে যারা এই ধরণের দাবীগুলো করেন তারা কি সৃষ্টিতত্ত্ববাদী খ্রিস্টান মৌলবাদী ওয়েব সাইটগুলো ছাড়া আর কিছু পড়ে দেখেছেন, তাদের কি আদৌ সময় হয়েছে বিবর্তনবাদের উপর লেখা একটাও পাঠ্য বই পড়ে দেখার? এই বইগুলো পড়লে তো চোখের সামনে সম্পুর্ণ ভিন্ন এক চিত্র ফুটে ওঠার কথা ছিলো। তারা দেখতে পেতেন কেমন করে দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন প্রকল্প পড়ে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পর্যাপ্ত পরিমাণে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কম্যুনিটি তাকে গ্রহণযোগ্য বলেই গন্য করছেন না। যে ছবিগুলো বিজ্ঞানের বইয়ে ছাপা হচ্ছে তার পিছনে কত ফসিল রেকর্ড রয়েছে তা কি তারা হিসেব করে দেখেছেন। তার উপর শুধু তো ফসিল রেকর্ডের উপরই নির্ভরশীল নয় আজকের বিবর্তনবাদ, পৃথক পৃথকভাবে আনবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, এমনকি অত্যাধুনিক জিনোমিক্স শাখার গবেষণা থেকে এর পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। চলুন দেখা যাক দু'একটি হাড় গোড়ের উপর ভিত্তি করে নাকি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ে মানুষ এবং বনমানুষ বা এপ এর মধ্যবর্তী ফসিলের কথা উল্লেখ করেছিলাম। মধ্যবর্তী ফসিলের উদাহরণ হিসেবে *Australopethicus afarensis* এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কি বা হতে পারে! তার মুখের আদল তখনও বনমানুষেরই মত, অথচ দুই পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখে গেছে, বনমানুষের চেয়ে বড় কিন্তু আধুনিক মানুষের চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট মস্তিষ্কের আকার! ডারউইন সেই সময়েই ধারণা করেছিলেন যে আফ্রিকার বনমানুষ থেকেই মানুষের উৎপত্তি হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে তখনও কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় তা প্রকল্প হিসেবেই থেকে যায়। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষের ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে বুঝতে শুরু করেন যে, এতদিন আমরা যাই ভেবে থাকি না কেনো মানুষের প্রজাতি আসলে একটি নয়, বহু মানব প্রজাতির পদচারণায় মুখরিত ছিলো এই পৃথিবী এক সময়। ফসিলবিদেরা বনমানুষ এবং আধুনিক মানুষের মাঝখানের বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল থেকে ধারণা করতে শুরু করেন যে, প্রায় ৪০-৮০ লক্ষ বছর আগে এই বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। একের পর এক ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, ডি এন এ র পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাইমেটদের মধ্যে অন্যরা নয় (ওরাং ওটাং বা গরিলা নয়) শুধু শিম্পাঞ্জীর সাথেই আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং এর প্রথম সংস্করণ(ড্রাফ্‌ট) তো হয়েছে সেই ২০০১ সালে, সেই সাথে ২০০5 সালে শিম্পাঞ্জির জিনোমও পড়ে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। গত দুই বছরে মানুষ, শিম্পাঞ্জী, বনোবো, গরিলা এবং ওরাং ওটাং এর জীনের তুলনামুলক গবেষণা থেকেও দেখা গেছে যে, ফসিলবিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত ফসিলগুলোর সাথে তাদের আবিষ্কার প্রায় হুবুহু মিলে যাচ্ছে, সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানের জার্ণালগুলো খুঁজলেই এই ধরণের হাজারো রিসার্চ পেপার পাওয়া সম্ভব। এ

তো আর হতে পারে না যে বিজ্ঞানের এতগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা থেকে পাওয়া পৃথক পৃথক ফলাফল 'ঝড়ে বক পড়া'র মত করে মিলে যাচ্ছে, আর বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা সেই ভন্ড সাধুর মত তার কৃতিত্ব নিয়ে যাচ্ছেন যুগের পর যুগ ধরে! গত ১৭ই মে ২০০৫ সালের 'Nature' জার্ণালে প্রকাশিত গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানীরা জিনোম পরীক্ষা করে এখন নিশ্চিত যে মানুষের এবং শিম্পাঞ্জীর পুর্বপুরুষেরা ৬৩-৫৪ লক্ষ বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো(১২)। এখানে আরেকটি উদাহরণ হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে, ফসিলবিদেরা গত শতকে নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষের বহু ফসিল আবিষ্কার করেছেন, তারা আমাদের আধুনিক মানুষের এতোই কাছাকাছি যে প্রথমে তাদেরকে আমাদের নিজেদের প্রজাতির আন্তর্ভুক্ত বলেই গন্য করা হয়েছিল। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে তর্ক বিতর্ক যেন আর শেষ হচ্ছিল না, অবশেষে ১৯৯৭ এ একদল বিজ্ঞানী ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিতর্কের অবসান ঘটালেন। তারা ১৮৫৬ সালে পাওয়া সেই নিয়ান্ডারথালের ফসিল থেকে ডি এন এ বের করে প্রমাণ করলেন যে, ফসিলটির বয়স আসলেই প্রায় ৩০,০০০ বছর এবং এর সাথে মানুষের আনেক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকলেও তারা আসলে আমাদের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়(১৩)। এ তো গেলো বিজ্ঞানের একটা দিক, এবার চলুন দেখা যাক ফসিল রেকর্ডগুলো কি ধরণের তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

৭০ দশকের প্রথম দিকে ইথিওপিয়া ও তানজেনিয়ায় *Australopethicus afarensis* (আফার অঞ্চল থেকে পাওয়া দক্ষিণের বনমানুষ) প্রজাতির আংশিক ফসিল পাওয়া যায়, এর মধ্যে ছিল হাটুর জয়েন্ট, পায়ের হাড়ের উপরের অংশ যেখান থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এরা দুই পায়ের উপর ভর করে হাটতে পারতো। কিন্তু তারপরের পাঁচ বছরের আরও বহু একই ধরণের প্রাজতির ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে যার মধ্যে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পান সেই বিখ্যাত লুসির প্রায় সম্পুর্ন কঙ্কালটি। শুধু তো তাই নয় তার সাথে আরও পাওয়া গেছে ১৩ টি *Australopethicus afarensis* এর ফসিল, অনেকেই মনে করেন যে এরা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একসাথে মৃত্যবরণ করেছিলো। এই সবগুলো ফসিলেরই বয়স ২৮-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে (১৩)। তাঞ্জেনিয়ার একটি অঞ্চলে আরও আনেকগুলো এই প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যাদের বয়স ৩৫-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে। সবচেয়ে অদ্ভুত যে জিনিষটি পাওয়া গেছে তা হল এই অঞ্চলে একই সময়ে ঘটা এক অগ্নুৎপাতের মধ্যে সংরক্ষিত এই প্রজাতির দু'টি প্রাণীর পায়ের ছাপ। এছাড়াও ৩০-৫০ লক্ষ বছরের এই প্রজাতির আরও বেশ কিছু আংশিক ফসিল পাওয়া গেছে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায়। প্রায় ২০ লক্ষ বছরের বেশি সময় ধরে বিবর্তিত হতে থাকা এই বিভিন্ন মাত্রার ফসিলগুলোর বিবর্তন দেখলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে কি করে মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরা ক্রমশঃ বনমানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি করে মানুষের মত বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে শুরু করেছিলো। মানুষের বিবর্তনের উপর লেখা যে কোন ভালো বৈজ্ঞানিক বই খুললেই এর বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। আর এরকম একটি দু'টি প্রজাতির মানুষের পূর্বপুরুষের তো নয়, অনেকগুলো প্রজাতির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত , যা নিয়ে মানুষের বিবর্তন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সহজে যে, কোন প্রকল্প গ্রহণ করেন না, পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যে প্রকল্প প্রকল্পই থেকে যায়, তার প্রমাণ স্বরূপ আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আফ্রিকার চাদ নামক দেশটিতে থেকে একটি মানুষের পুর্বপুরুষের সম্পুর্ণ মাথার খুলি পাওয়া গেছে যার বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০-৭০ লক্ষ বছর। খুব সম্প্রতি কেনিয়া এবং ইথিওপিয়ায় প্রায় একই সময়ের আরও দু'টি ফসিলের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও এদেরকে এখনও সবচেয়ে পুরোনো মানুষের পুর্বপুরুষের ফসিল বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ কারণ তাদের মতে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর মত পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি । লন্ডনের ন্যাচারাল হিষ্ট্রি মিউসিয়ামের মানুষের উৎপত্তি বিভাগের প্রধাণ Chris Stringer এবং প্রাক্তন প্রধাণ Peter Andrews এর লেখা খুব সাম্প্রতিক (২০০৫ সালে প্রকাশিত) বই The Complete World of Human Evolution এ তারা খুব

পরিষ্কারভাবেই বলছেন যে, এ সম্পর্কে কোন শেষ সিদ্ধান্তে আসা এখনও সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে জুরির রায় এখনও প্রকাশ করার সময় হয়নি(১৪)।

এখন, যারা বলেন দু'একটা হাড় গোড় থেকে বিজ্ঞানীরা এধরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছান তাদের কি উত্তর

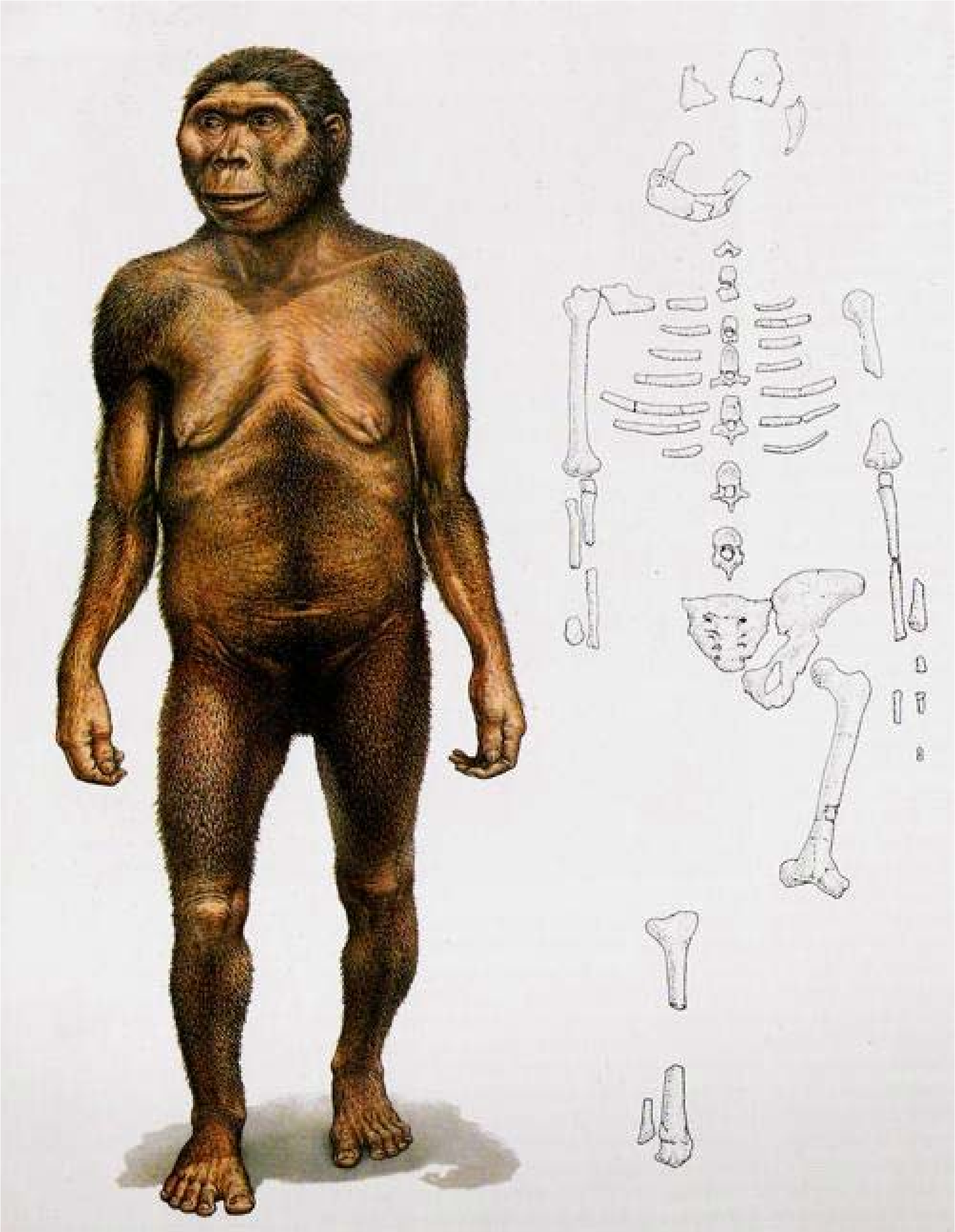

ছবিঃ লুসির ফসিল এবং তা থেকে আঁকা সম্ভাব্য প্রতিকৃতি (১৪)

দেওয়া উচিত আসলেই বুঝতে পারি না। 'আরেকটু ধৈর্য নিয়ে পড়ে দেখুন' বা 'বই পড়ুন' ধরণের উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কি বা করার থাকতে পারে এখানে। এই ধরণের বিস্তারিত

অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বিজ্ঞানীরা ছবি আঁকেন বিভিন্ন প্রজাতির, মনগড়া ছবি এঁকে দেওয়ার অবকাশ কোথায় এখানে? উপরের *Australopethicus afarensis* এর ছবিটি আঁকা হয়েছে উপরে বলা সবগুলো সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে, এর পরে কেউ যদি বলেন আমরা তো ৩০-৪০ লক্ষ বছর আগে ওখানে দাড়িয়ে ছিলাম না, কিংবা এটি হচ্ছে বিজ্ঞানীদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা তখন আসলেই আর কিছু বলার থাকে না।

আজকে একইভাবে মাছ থেকে সরীসৃপের, কিংবা সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী, ডায়নোসর থেকে পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে তিমি সহ বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। তারপরও বিজ্ঞানীরা এখনও আনেক বিষয়ের খুটিনাটি নিয়েই বিতর্ক করে চলেছেন, তবে বিতর্ক আজকে বিবর্তন হচ্ছে বা হয়েছে কিনা তা নিয়ে নয়, কোন জীবের বিবর্তন ঠিক কবে হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, কোন প্রক্রিয়া বেশী কাজ করেছে তার পিছনে, ডি এন এ বিশ্লেষনের সাথে তা মিলে যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। তাই সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা যখন বিবর্তন তত্ত্বের মুল বিষয়গুলো নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন তখন তাদের উদ্দেশ্য কতখানি নিষ্পাপ তা নিয়ে প্রশ্ন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

৪) একই রকম বিবর্তন কেনো বারবার ঘটতে দেখা যায় না, যেমন ধরুন একবার বনমানুষ থেকে মানুষ হয়েছিলো এখন কেনো তা আর হয় না?

- অনেক বিবর্তনই মিউটেশনের মত আকষ্মিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আবার শুধু মিউটেশন বা জেনেটিক রিকম্বিনেশনের মত ব্যাপারগুলো তো ঘটলেই হবে না, তাকে আবার নির্দিষ্ট কোন পরিবেশে সেই জীবকে টিকে থাকার জন্য বাড়তি সুবিধা যোগাতে হবে যার ফলে তা সমস্ত জিন পুল বা জনসমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়তে হবে। যেমন ধরুন, প্রায় ৬০-৮০ লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে যে মিউটেশনগুলো ঘটার ফলে সেই নির্দিষ্ট পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিবর্তন ঘটেছিলো তা আবার একইভাবে ঘটা এবং সেই সাথে পারিপার্শ্বিকতা সহ আন্যান্য সবগুলো ফ্যাকটরের সংযোগ বা সমন্বয় আবার একই রকমভাবে ঘটা প্রায় একটি অসম্ভব ঘটনা। বিজ্ঞানী যে গুলড তার Wonderful Life ঃ বই তে বলেছিলেন যে বিবর্তনের টেপটি যদি রিওয়াইন্ড করে আবার নতুন করে চালানো হয় তাহলে ফলাফল কখনই একই হবে না(১৫), এর কারণ আছে। বিবর্তন একটি আনেকাংশেই ইতিহাস-আশ্রয়ী বিজ্ঞান। ইতিহাসকে খুব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সব সময় আগেভাগেই তা নিঁখুতভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। অনেকেই জানেন, বিজ্ঞানী ল্যাপ্লাস সেই আঠারো শতকের শেষ দিকে আস্থার সাথে ডিটারমিনিজম বা নিশ্চয়তাবাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন; তিনি বলেছিলেন, প্রতিটি কণার আবস্থান ও গতি সংক্রান্ত তথ্য যদি জানা যায়, তবে ভবিষ্যতের দশা সম্বন্ধে আগে ভাগেই ভবিষ্যদ্বানী করা যাবে। কিন্তু বৈশ্বিক জটিলতার প্রকৃতি (nature of universal complexity) তার সে উচ্চাভিলাসী স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অনাকাংক্ষিত বিশৃংখলা আর অভূতপূর্ব জটিলতা যার ফলশ্রুতিতে প্রতি মিনিটেই জন্ম নেয় নানা ধরনের নাটকিয় আনিশ্চয়তা। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর প্রকৃতি পরিবেশ যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তার চিহ্ন আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই জীবের বিবর্তনের ইতিহাসে, এটি সত্য, কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনলো যদি অন্যভাবে ঘটতো তাহলে জীবের বিবর্তনের ধারাও যে অন্যরকম হত তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানুষের উৎপত্তির ব্যাপারটাই ধরা যাক। এটি সৌভাগ্যপ্রসূত হাজার খানেক ঘটনার সমন্বয় ছাড়া কখনই ঘটতে পারতো না। ঘটনাগুলো যদি অন্যরকম ভাবে ঘটতো, তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত হয়তো কোন ‘মানবীয় সত্তা’র উন্মেষ ঘটতো না। কয়েকটি ঘটনা পর্যালোচনা করা যাক (১৬):

(ক) আমাদের পূর্বসূরী সেই আদিম বহুকোষী জীবগুলো যদি ৫৩০ মিলিয়ন বছর আগে ক্যাম্বরিয়ান বিস্ফোরনের সময় উত্তপ্ততা আর তেজস্ক্রিয়তা সহ নানা উৎপাত সহ্য করে টিকে না থাকতো, তবে হয়তো পরবর্তীতে কোন মেরুদন্ডী প্রাণীর জন্ম হত না।

(খ) সেই লোব ফিন বিশিষ্ট অনাকর্ষনীয় মাছ গুলো যারা দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর নিজস্ব ওজনকে বহন করার ক্ষমতা রাখে, সগুলোর উদ্ভব না ঘটলে মেরুদন্ডী প্রাণীগুলোর ডাঙ্গায় উঠে রাজত্ব করার স্বপ্ন কখনই পূরণ হত না।

(গ) ৬৩ মিলিয়ন বছর আগে এক বিশাল উল্কাপিন্ড পৃথিবীতে আছরে পড়ে বা যে কারণেই হোক বিশালাকার ডায়নোসরগুলোর অবলুপ্তির কারণ না ঘটাতো, তাহলে হয়ত স্তন্যপায়ী জীবগুলো আর বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেত না; বরং ডায়নোসরদের প্রবল প্রতাপের সামনে ‘কুনো ব্যাঙ’ হয়ে রইতো।

(ঘ) যদি আফ্রিকার গহীন অরন্যে দুই থেকে চার মিলিয়ন বছর আগে ‘লুসি’ রা দেহের ভিতরে ঘটা মিউটেশন এবং সেই পরিবর্তগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য তখনকার সেই পরিবেশগত সুবিধাগুলো না পেয়ে তারা দু’পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াবার আর চলবার মত সুগঠিত হতে না পারত, তবে হয়তো আমরা শিম্পাঞ্জী বা গরিলা জাতীয় কোন কিছু হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতাম।

কাজেই দেখা যাছে পুরো মানব বিবর্তনটিই দাড়িয়ে আছে অনেকগুলো আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়ে। বিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়াটা আবার প্রথম থেকে চালানো গেলেও সে ‘দৈবাৎ ঘটে যাওয়া’ ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটবেই, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেনা।

আবার কখনও কখনও একইরকমের বিবর্তন যে সম্পুর্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন জীবে ঘটে না তাও নয়। এর ফলে দুইটি জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল দেখা গেলেও তাদের বিবর্তন কিন্তু ঘটেছে সম্পূর্ণভাবে দু’টো আলাদা প্রক্রিয়ায়। প্রকৃতিতে এরকম সমন্তরাল বিবর্তনের উদাহরণ রয়েছে অনেক। যেমন ধরুন, মানুষ এবং মলাঙ্কের চোখের মধ্যে আনেক মিল থাকলেও (ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন অধ্যায় দেখুন) তাই তাদের মধ্যে গঠণগত পার্থক্যও রয়েছে অনেক।

৬) বিবর্তন তাপগতিবিদ্যার(thermodynamics) দ্বিতীয় সূত্রকে লংঘন করেঃ

এটি যারা বলেন তাদের তাপগতিবিদ্যা এবং এর সূত্রগুলো সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা নেই। তাপগতিবিদ্যার তিনটি সুত্র আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটি বলছে : ‘তাপ কখনও নিজে থেকে শীতল বস্তু হতে গরম বস্তুতে যেতে পারে না।’ সূত্রটিকে অনেক সময় এভাবেও বলা হয় : ‘একটি বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কখনও কমতে পারে না।’

এনট্রপি ব্যাপারটিকে অনেকসময় সাদামাটাভাবে বিশৃঙ্খলা বা disorder হিসেবে দেখানো হয়। এনট্রপি কমার অর্থ হচ্ছে সাদামাঠা ভাবে বিশৃংখলা কমা। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র বলছে বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কমতে পারবে না, বাড়তে হবে।

বোঝা যাচ্ছে যে, তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি যে ভাবে বলা হচ্ছে তা শুধু বদ্ধ সিস্টেমের জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের বাসার রেফ্রিজেটরের উদাহরণটি হাজির করি। আমরা সবাই জানি যে, রেফ্রিজেটরে তাপকে শীতল অবস্থা থেকে গরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, ফলে সেখানে পানি জমে বরফ হতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে রেফ্রিজেটরের ভিতরে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু তাপকে এই 'উলটো দিকে' চালিত করার জন্য রেফ্রিজেটরকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। কাজ করবার শক্তিটুকু রেফ্রিজেটরটি কোথা হতে পায়? রেফ্রিজেরটের পেছনে লাগানো মোটর আর কিছু জ্বালানী এই শক্তিটুকু সরবরাহ করে। কিন্তু এই শক্তিটুকু সরবরাহ করতে গিয়ে তারা ঘরের এনট্রপিকে বাড়িয়ে তোলে। এবারে খাতা কলম নিয়ে হিসেব কষলে দেখা যাবে পানিকে বরফ করে রেফ্রিজেটর তার ভেতরে এনট্রপি যত না কমিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়িয়ে তুলেছে ঘরের এনট্রপি। কাজেই যোগ-বিয়োগ শেষ হলে দেখা যাবে এনট্রপির নেট বৃদ্ধি ঘটেছে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শুধুমাত্র রেফ্রিজেটরের ভিতরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারে, এনট্রপি তো কমে গেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো সিসটেম (ওপেন সিস্টেম) গোনায় ধরলে দেখবে যে, এনট্রপি আসলে কমেনি, বরং বেড়েছে।

বিবর্তনের ব্যাপারটাও তেমনি। সূর্য আমাদের এ পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত শক্তির যোগান দিয়ে চলেছে। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবদেহে কোষের বৃদ্ধি ঘটে, এবং কালের পরিক্রমায় বিবর্তনও ঘটে। শুধুমাত্র জীবদেহের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে যে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু ঠিকমত হিসেব-নিকেশ করলে তবেই বোঝা যবে যে, এই 'আপাতঃ এনট্রপি' কমাতে গিয়ে শক্তির যোগানটা পড়ছে অনেক বেশী। কাজেই এনট্রপির আসলে নীট বৃদ্ধিই ঘটছে।

প্রকৃতিতে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উত্তরণের উদাহরনের অভাব নেই। এমনকি জড়জগতেও 'আপাতঃ এনট্রপি' কমার উদাহরণ রয়েছে বিস্তর। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, লবনের মধ্যে কেলাস তৈরী, কিংবা পাথুরে জায়গায় পানির ঝাপটায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে বিরল নয়। কোনটির ক্ষেত্রেই তাপগতির সূত্র ব্যহত হয়নি। কাজেই কালের পরিক্রমায় সরল জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে জটিল জীবের অভ্যুদয় কোন অসম্ভব ঘটনা নয়, নয় তাপগতিবিদ্যার লংঘন।

তথ্যসুত্রঃ

1. Futuyma, D.J. (2005), Evolution, pg.523, Sinauer Associates, INC, MA, USA

2. Gould, Stephen, Jay (1994).Evolution as Fact and Theory. http://www.stephenjaygould.org/library/gould-and-theory.htm

3. Dawkins, Richard. (2004), the Ancestor's Tale, A pilgrimage to the dawn of evolution , pg.86, Houghton Miffin Company, Boston, New york.

4. Futuyma, D.J. (2005), Evolution, pg 76, Sinauer Associates, INC, MA, USA

5. Raymond Sutera, (2001) The Origin of Whales and the Power of Independent Evidence, TalkOrigin website. http://www.talkorigins.org/features/whales/

6. Gingerich, P. D. 2005 . Cetacea. In K. D. Rose and J. D. Archibald (eds.), Placental mammals: origin, timing, and relationships of the major extant clades,

Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 234-252. http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDFfiles/PDG432_rosearch_cetacea_opt.pdf

7. Gingerich, P. D. Research on the Origin and Early Evolution of Whales (cetacea), http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

8. Gingerich, P. D. The Land to Sea Transition in early Whales, Paleobiology, 29(3), 2003, pp.429-454
http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

9. Was Darwin Wrong, National Geographic, November 2004 edition.

10. NII/National Human Genome Reserach Institute, 'New Genome Comaprison Finds chimps, humans very similar at DNA level, September 2005, Originally published in journal 'Nature', September 1, 2005.
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm

11. Benton, Michael, 2001. Evidence of Evolutionary Transitions. Originally published in American Institute of Biological Sciences.
http://www.actionbioscience.org/evolution/benton2.html

12. Broad Institute of MIT and Harvard, May 2006, Human and chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, Originally published in Nature Online, May 17, 2006.
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

(13) Stringer, C. and Andrews, P (2005), The Complete World of Human Evolution, pg 178-180.Thames and hudson Ltd, London.

14) Stringer, C. and Andrews, P (2005), The Complete World of Human Evolution, pg 117-118.Thames and hudson Ltd, London.

15) Interview with Futuyma, D. Evolution in action Natural Selection: How Evolution Works, An ActionBioscience.org original interview, Dec 2004.http://www.actionbioscience.org/evolution/futuyma.html

16) Gould, S Jay, The evolution of life on earth, Scientific American, October, 1994